সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

বর্তমান যুগ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। অবশ্যই মোবারকবাদ জানাতে হয় এমন পদক্ষেপের। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ব্যাংকের হ্যাকিংয়ের ঘটনা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হ্যাকিংয়ের ঘটনা আমাদের সবাইকে সাইবার হামলা সম্পর্কে ভীত করে তুলেছে। দিন দিন যতই সেবা বিশেষ করে আর্থিক সেবা অনলাইনে আসবে, ততই এই বিপদের সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। অনলাইন সেবার সবচেয়ে বড় ভয় হলো, যখনই কোনো সেবা অনলাইনে যাচ্ছে তখনই সেটা সারা পৃথিবীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বের যেকোনো জায়গাতে থাকা হ্যাকারেরা তা অ্যাক্সেস করতে পারছে বা হানা দিতে পারছে। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেখাচ্ছেন, তা সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে সাইবার নিরাপত্তার দিকেও নজর দিতে হবে। এখন থেকেই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে, বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যক। ঘরে বসে বাস বা ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ, অনলাইনে ভর্তির আবেদন, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সচ্ছল হওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সব ধরনের তথ্য পাওয়া, দূর দেশে থাকা স্বজনের শুধু কণ্ঠস্বরই নয় জীবন্ত ছবি দেখতে পাওয়ার মতো আনন্দও উপভোগ করা যাচ্ছে প্রযুক্তির প্রসারের কারণে।

পৃথিবীতে সবকিছুরই ভালো-মন্দ দুটি দিক থাকে। ঠিক তেমনি তথ্যপ্রযুক্তিরও ভালো-মন্দ দুটি দিক আছে। এই তথ্যপ্রযুক্তি একদিকে যেমন আমাদের জীবনকে সহজ-সরল ও সাবলীল করে তুলছে, ঠিক তেমনি এর বহুল ব্যবহারের ফলে দিন দিন বেড়ে চলছে সাইবার ক্রাইম।

কী এই সাইবার ক্রাইম?

সহজ কথায় বলতে গেলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সংঘটিত হওয়া অপরাধগুলোই সাইবার ক্রাইম। বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত কয়েকটি সাইবার ক্রাইম হলো– ০১. সাইবার পর্নোগ্রাফি, ০২. হ্যাকিং, ০৩. স্প্যাম, ০৪. বোমাবাজি ও ০৫. অ্যাকশন গেম ইত্যাদি।

আমাদের দেশেও সাইবার ক্রাইম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায় সবার হাতেই স্মার্টফোন ও খুব সহজেই ল্যাপটপ কমপিউটার পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারের সহজলভ্যতা একদিকে যেমন আমাদেরকে সাহায্য করছে এগিয়ে যেতে, তেমনি এর অন্ধকার জগতের হাতছানি গ্রাস করছে অনেককেই।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর তরুণ বা শিশুদের সেই আকর্ষণ থাকে বেশি। যার ফলে আমরা একটু লক্ষ করলে দেখব সংঘটিত হওয়া সাইবার ক্রাইমের বেশিরভাগ অপরাধী যেমন তরুণ, তেমনি ভুক্তভোগীও কিন্তু এই তরুণ।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সহজলভ্যতা এবং এই ব্যবহারের গতিবিধি নির্ধারণের যথাযথ কোনো ব্যবস্থা না থাকায় যেকেউ ইন্টারনেটের বিশাল জগতে যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিচরণ করতে পারে। যে বয়সে তরুণ বা শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে, সেই বয়সে তাদের অনেকেই যেমন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিত্যনতুন বিষয় জানতে ও শিখতে পারছে, একইভাবে হয়তো ভুলবশত কিংবা কৌতূহলবশত নিজের অজান্তেই পরিচিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের সাথে, যা তাদের মানসিক বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে বিকৃত মানসিকতা।

এছাড়া আমাদের বর্তমান যুগের অভিভাবকেরা যেমন কখনও খুব সচেতন, কখনও বা আবার খুব খামখেয়ালি হয়ে ওঠেন। তারা দ্রুত পাল্টাতে থাকা সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কখনও নিজেদের সন্তানদের খুব শাসন করছেন, আবার কখনও খুব সীমিত করে দিচ্ছেন। যার ফলে তাদের সাথে ঠিক বন্ধুত্ব কখনও গড়ে ওঠে না। তাই তারা নিজেদের মনে জাগা প্রশ্ন কিংবা কৌতূহল নিজেদের মতো করে মিটিয়ে নেয়। তারা ভালো-মন্দের গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে যায়। এই তরুণরা বা শিশুরাই কিন্তু পরবর্তী সময়ে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে।

২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে সাইবার ক্রাইম এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বের অন্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সাইবার ক্রাইম আইন আছে। বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইমের পরিচিতি বা এ সংক্রান্ত অপরাধ দমনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ আমাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়। এই আইনে ইন্টারনেট অর্থ এমন একটি আন্তর্জাতিক কমপিউটার নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে কমপিউটার, সেলুলার ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারীরা বিশ্বব্যাপী একে অন্যের সাথে যোগাযোগ ও তথ্যের বিনিময় এবং ওয়েবসাইটে উপস্থাপিত তথ্য অবলোকন করতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে– (১) যদি কোনো ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জানা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করেন, যার ফলে কোনো কমপিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্যবিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনোভাবে একে ক্ষতিগ্রস্ত করে। (২) এমন কোনো কমপিউটার সার্ভার, কমপিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে এর ক্ষতিসাধন করেন যাতে তিনি মালিক বা দখলদার নন, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি হ্যাকিং অপরাধ। কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন বা উভয়দণ্ড দেয়া যেতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে– যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা যার মাধ্যমে মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হয়, তাহলে তার এই কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে।

আমাদের দেশের অনেকেই এই সাইবার আইন সম্পর্কে জানেন না। আর যারা জানেন তারা সমাজের ভয়ে নিজের বা আপনজনের সাথে সংঘটিত হওয়া অপরাধের ব্যাপারে চুপ করে থাকেন। যার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর সাজা হয় না। তবে এই আইন আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশের বড় বাধা এই সাইবার ক্রাইম। তাই সামাজিক অবক্ষয় রোধে এবং স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য এই সাইবার ক্রাইমের প্রতিকার ও প্রতিরোধ প্রয়োজন। অপরাধীদের জন্য প্রয়োজন আরও কঠোর আইন এবং শাস্তি বাস্তবায়ন।

অপরদিকে ইন্টারনেটের অন্ধকার দিকগুলোর দরজায় তালা লাগানোটাও জরুরি। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতনতা, তরুণ প্রজন্মের সঠিক মানসিক বিকাশই শুধু এই সাইবার ক্রাইম বন্ধ করতে পারে। তবে সাইবার ক্রাইম ও সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে ডিগ্রি চালু করা উচিত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক সাইবার নিরাপত্তা বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত, যাতে আমাদের নারীরা সাইবার স্পেসে আরও নিরাপদ থাকতে পারেন কজ

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com